দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 0[illegible] MAR 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৯

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

উচ্চ শিক্ষার বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র

—ডঃ আজিজুর রহমান

বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস অতীতের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে চরমে উপনীত হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পরে এমন ব্যাপক এবং ভয়াবহ সন্ত্রাস আর কখনো দেখা যায়নি। ১৯৭১-এর স্বাধীনতার পরে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসের সূত্রপাত হয়। ১৯৭৩-এর ডাকসু নির্বাচনে তৎকালীন ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অঙ্গ সংগঠন ছাত্রলীগ কর্তৃক ব্যালট বাক্স ছিনতাই এবং সূর্যসেন হলে ৭ জন ছাত্র হত্যার ঘটনা সমগ্র দেশবাসীকে হতবাক করে দেয়। এ সময়েই এদেশের শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস বিশ্বের সকল নজির ছাড়িয়ে গেল। এ থেকে শুরু হলো সন্ত্রাসের দ্রুত প্রসার। ১৯৭৫-এর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়সহ জেলা এবং মহকুমা শহরের কলেজগুলোতে সন্ত্রাসের বীজ ছড়িয়ে পড়লো।

পাকিস্তান আমলেও এদেশের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ছিল। তবে এ সন্ত্রাস ছিল সীমিত এবং কিল-ঘুষি বড়জোর হকিস্টিকের ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ধরনের সন্ত্রাসের অস্তিত্ব তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত অনেক দেশেই কম-বেশী ছিল। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরে বাংলাদেশে সন্ত্রাসের যে কলুষিতরূপ প্রকাশিত হলো তার নজির সভ্যতার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলাদেশের সন্ত্রাসের ভয়াবহতাকে মাত্রাগত দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে হলে দেশের দু'দশকের শাসন-কালকে মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করা যায়। প্রথম অংশকে সূচনাকাল যা ঘটেছিল আওয়ামী লীগ শাসন আমলে। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে ১৯৭৫ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ সময়কালে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস ক্রমশ বাড়তে থকে। দেশব্যাপী সন্ত্রাসের প্রসারতা আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় চরম ভাটা পড়ে। এরপরে উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য ক্ষমতায় আসেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি প্রথমদিকে ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে ছিলেন। স্বাধীন দেশের ছাত্রদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণের প্রয়োজন নেই। কারণ, ছাত্রদের পিতামাতা এবং অভিভাবকগণ জনগণের মঙ্গলামঙ্গল দেখতে যথেষ্ট। সুতরাং ছাত্ররা জ্ঞান চর্চায় ব্যাপৃত থাকুক—এমন একটা অভিলাষ তিনি পোষণ করতেন। তাঁর শাসন আমলের প্রথম কয়েক বছরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাস বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু চার পার্শ্বের স্বঘোষিত অতি বুদ্ধিমান দল ছুট কতিপয় রাজনীতিবিদরা নিজেদের কর্মদক্ষতা প্রমাণ করার জন্য জিয়াকে ছাত্র রাজনীতিতে টেনে আনেন। এ সময় গঠন করা হলো বিএনপি'র ছাত্র সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। তখন ছাত্রদলকে চ্যালেঞ্জ করার লক্ষ্যে ছাত্রলীগ তাদের অস্ত্রভাণ্ডারকে শক্তিশালী ও আধুনিকায়ন করতে শুরু করলো। ফলে ছাত্রদলের হাতেও অস্ত্র এসে গেল। এভাবেই শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাসের কালোছায়া ছড়িয়ে পড়ল। জেনারেল এরশাদ ক্ষমতায় এসে কিছুদিন তার রাজনৈতিক দলকে ছাত্র রাজনীতির বাইরে রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরে তিনিও নতুন বাংলা ছাত্র সমাজ নামে একটা ছাত্র সংগঠন গঠনের চেষ্টা করেন। তার ইপ্সিত ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার মূল দায়িত্ব পালন করেন বামপন্থী ছাত্র রাজনীতি থেকে দলছুট দিয়ে আসা দুইজন সাবেক ছাত্রনেতা। মন্ত্রীত্বের বিনিময়ে এরা এরশাদের দলে ঝুঁকলেন। কিছু সন্ত্রাসী ছাত্রদের হাতে টাকা এবং অস্ত্র তুলে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকার প্রয়াস চললো। কিন্তু বিদ্যমান ছাত্র সংগঠনের তীব্র প্রতিরোধের মুখে এ প্রয়াস ব্যর্থ হলো। কেন্দ্রীয় ছাত্ররাজনীতির অঙ্গ স্থান সংকুলনের অভাবে হাল ছাড়তে হ[illegible] জাতীয় পার্টিকে। বোল প্যাল্টানো হ[illegible] সুর তোলা হলো ছাত্র রাজনীতি বন্ধ ক[illegible] কিন্তু সেই ভণ্ডামির সুর তেমন কোন জাগাতে পারলো না। ফলে সুর বেসুরে পতনের পূর্বে আবার অ[illegible] অস্ত্রের ডানায় ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশের চেষ্টা হলো। পূর্বের ন্যায় একইভাবে তা ব্যর্থ হল[illegible] প্রবল ছাত্র আন্দোলন আর গণবিক্ষভোর প্রতাপে পতন হলো এরশাদ সরকারের। অভ্যূদয় ঘটল গনতান্ত্রিক সরকারের। '৯০-এর ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক অন্দোলন মানুষের মনে স্বভাবত আশার সঞ্চার করেছে। মানুষ স্বপ্ন দেখেছে সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গনের এবং সৃষ্টিমুখী সামাজিক পরিবেশের। কিন্তু অবস্থা হয়েছে উল্টো। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা উল্টালেই শিক্ষা অঙ্গনের সন্ত্রাসের সংবাদ পাওয়া যায়। অতীতের চেয়ে সন্ত্রাস এখন অনেক সুসংগঠিত এবং ব্যাপকতর। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এ সন্ত্রাসী অবস্থায় জনগণের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে স্বৈরশাসনের অবসানে দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে এখন কারা সন্ত্রাস করছে? এরশাদের শাসনকালে সরকারে প্রতি জনগণের সমর্থন ছিল না। তাই ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তারা সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছে। বর্তমানে জনসমর্থিত একটি সরকার ক্ষমতাসীন রয়েছে। কিন্তু এখন কেন সন্ত্রাস বেড়ে গেলো? সন্ত্রাসের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক বলেছেন যে, আওয়ামী লীগের লক্ষ্য হচ্ছে সন্ত্রাসের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো দখল করে ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে বিএনপি সরকারের পতন ঘটানো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ঘটনাপুঞ্জ বিশ্লেষণ করলে উল্লেখিত বক্তব্যের সত্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ সন্ত্রাসের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করত চাইছে। বিএনপি সমর্থিত ছাত্রদল তাদের প্রতিহত করতে চাইছে। উভয় দলের হাতেই রয়েছে অস্ত্র। অস্ত্র দিয়ে করছে অস্ত্রের মোকাবেলা। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি উভয় দল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। সংসদীয় গণতন্ত্রের আইন পাশ করে উভয় দল মহা উল্লাস প্রকাশ করেছে। কিন্তু এখন কেন আওয়ামী লীগ অগণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা দখল করতে চাইছে? কেন একটি গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টা চলছে? এসব কি কোন গণতান্ত্রিক ধারার মধ্যে পড়ে? নিশ্চয়ই না। তা হলে কি গনতন্ত্র মুখের বুলি, অন্তরের কথা যে কোন মতে ক্ষমতা দখল?

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণা দেশের বর্তমান সর্বগ্রাসী শিক্ষা সন্ত্রাসের পশ্চাদে একটি বিদেশী শক্তিও রাজনৈতিক মহলের সংগে একযোগে কাজ করছে। তারা এদেশের উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে নিজেদের ফায়দা লুটার চেষ্টা করছে। শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসের জন্য যে স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে তা দেশের বাইরে থেকে আসছে। এসব অস্ত্র এবং অর্থ তুলে দিয়ে একটি সুনির্দিষ্ট ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী চক্রের মাধ্যমে প্রকতিটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে। এ সন্ত্রাসের স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন দুটো লক্ষ্য রয়েছে। স্বল্পকালীন লক্ষ্য হচ্ছে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারকে জনগণের কাছে অকর্মন্য প্রমাণ, দেশে উচ্চ শিক্ষার পরিবেশ ধ্বংস করা, উৎপাদন উপযোগী পরিবেশ নষ্ট করে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে দেয়া এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিপর্যস্ত করা। দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিপন্ন করা।

সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সন্ত্রাস নিয়ে উদ্বিগ্ন। তবে এ পর্যন্ত যা কিছু পদক্ষেপ সন্ত্রাস প্রতিরোধের জন্য গ্রহণ করা হয়েছে তা পরিস্থিতির গুরুত্বের তুলনায় অতি ন্যূনতম। সন্ত্রাস বন্ধ করার জন্য একটি সর্বদলীয় সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি কাজ করছে। তবে পরিস্থিতির অবনতি এখন ও অব্যাহত রয়েছে। বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, এক ঘন্টার মধ্যে দেশের সমস্ত সন্ত্রাস বন্ধ করা যায়। সরকারের সন্ত্রাস দমনের সদিচ্ছা নেই। সরকার সন্ত্রাস দমনের জন্য বিরোধী দলকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে কাজ করতে চাইছে। তারা ভাবছেন স্ব-স্ব দল তাদের নিজ নিজ ছাত্র সংগঠনকে নিরস্ত্র করে সন্ত্রাস বন্ধ করতে এগিয়ে আসবে। এটা যে কোন দিনই সফল হবে না তা বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে বুঝা যায়। এছাড়া শিক্ষাঙ্গণে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে যারা নিয়োজিত তারা অধিকাংশ কোন রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী নয়। তারা বেতনভুক্ত সন্ত্রাসী। অস্ত্রবাজী করে অর্থ উপার্জন তাদের পেশা। সুতরাং রাজনৈতিক দলের নসিয়তে তারা অস্ত্র পরিত্যাগ করবে এমনটি আশা করা যায় না। একদল অস্ত্র ত্যাগ করতে বললে তারা অন্য দলে চলে যাবে। অথবা বেশী অর্থের প্রলোভন পেলেও তারা একদল ত্যাগ করে অন্য দলরে সদস্য হতে পারে। এমন দৃষ্টান্ত জনগণের সামনে ঢের রয়েছে। এছাড়া সকল উৎস বন্ধ হলেও বিদেশী উৎস থেকে অস্ত্র ও অর্থ প্রাপ্তি বন্ধ হবে না। অন্যান্য অপরাধের মত সন্ত্রাসকে কঠোর আইনের বাস্তব প্রয়োগ দ্বারা বন্ধ করতে হবে। কোন নমনীয় প্রয়াস এক্ষেত্রে সফল হবে না। এ অপরাধের জন্য একমাত্র সাজা মৃত্যুদণ্ড করে আইন পাশ করতে হবে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ধুয়া তুলে ছাত্র-সন্ত্রাসকে আশ্রয় দেয়া হচ্ছে। স্বায়ত্তশাসন অর্থ স্বাধীনতা নয়। দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের অধীনেই এক একটি প্রতিষ্ঠানমাত্র। দেশের বিদ্যমান আইন দ্বারাই চালিত। একজন নিষিদ্ধ অস্ত্রধারী সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলেরই হোক আর কোন বস্তিরই হোক আইন সবার জন্যই সমান। একজন অস্ত্রধারী বা খুনিকে বস্তি হতে ধরতে গেলে বস্তির নেতা বা ওয়ার্ড চেয়ারম্যান কারও পূর্বানুমতি প্রয়োজন হয় না। একইভাবে কোন বিশ্ববিদ্যালয় হতে কোন অস্ত্রধারী বা খুনিকে ধরার জন্য কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই। কারণ দেশের সমজাতীয় সকল অপরাধের জন্য একই আইন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ/বিডিআর/সেনাবাহিনী ঢুকলে শ্লোগান দেয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অমুক কেন কর্তৃপক্ষ জবাব চাই। বলা হয় বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গন অপবিত্র হয়েছে। কিন্তু কিভাবে অপবিত্র হয় তা বোধগম্য নয়। কারণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বা সেনাবাহিনীর সদস্যকেই অপবিত্র নয়। এছাড়া তারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার মত অতি পবিত্র কাজে নিয়োজিত। এমন মহতী কাজে নিয়োজিত বাহিনীর সদস্যরা ঢুকলে কিভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটি অপবিত্র হয়ে যায়। তা বুঝা দুস্কর। আর এসব বাহিনীর সদস্য যে উদ্দেশ্য নিয়ে সেখানে ঢুকে তা হলো সন্ত্রাস দমন, অস্ত্র উদ্ধার এবং অপরাধীকে পাকড়াও করা। শিক্ষানের শিক্ষার পরিবেশ রক্ষা করা সরকারের পবিত্র দায়িত্ব। একটি দেশের শিক্ষার অগ্রগতি সামগ্রিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। এছাড়া শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার। সরকার হিসেবে এ মৌলিক অধিকার থেকে জনগণ যাতে বঞ্চিত না হয় তা দেখা সরকারের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ অধিকারকে সুরক্ষিত করার জন্য জনগণের খাদেম হিসেবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বা প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করে। এদের প্রবেশে যারা বিশ্ববিদ্যালয় অপবিত্র হবার শ্লোগান তুলেন তারাই দেশের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ও জনগণের শত্রু।

এখন দেখা যাক বর্তমান সরকার দেশের শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূল করতে এ যাবত কতটা সফল হয়েছে। এ যাবত সরকারের সফলতা খুবই কম।

চলবে